ভূমিকা

বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু লোকের মুখে তাদের জীবনের কথা শুনতে গিয়ে জানলাম পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মন্বন্তরের উপন্যাস সমূহ সংগ্রহ করে পড়তাম। মন্বন্তরের সমস্ত উপন্যাসে যেন এক করুণ রসের ছড়াছড়ি, পড়ে বিমর্ষ হয়ে যেতো মন। উপন্যাসের প্লট, চরিত্রকে ঢেকে চোখে ভেসে উঠতো বাস্তবতা। যেন চোখের সামনে দেখছি ১৯৪৩-৪৪এর সেই ভয়াবহ দুর্যোগ। এই উপলব্ধি সম্ভব হচ্ছে যে শিল্পীদের অবদানে তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টির এবং বাস্তবতার তুলনা করার আগ্রহ জাগে মনে। কাজে হাত দেয়া হলো 'বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর' শিরো নামে গবেষণা পত্রে। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম উপন্যাস নয়, বাস্তব বিষয়-টাই বড়ো,আমাদের কাছে নয়, সে শিল্পীদের কাছে, যাঁরা পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে তাঁদের উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁদের 'শিল্প'কেও বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁদের দৃষ্টিতে, যেখানে শিল্প সার্থকতা বড়ো নয়, বাস্তবকে সব চেয়ে বেশী স্পর্শ করাটাই বড়ো। কেন এতগুলি মানুষের হনন ? কিভাবে তা ঘটেছিল ? কারা ঘটিয়েছিল ? শাসকদের, ব্যবসায়ীদের, শিল্পীদের, রাজনীতিবিদদের ভূমিকা তখন কি ছিল ? সমাজের কি পরিবর্তন ঘটল ? এ প্রশ্নগুলি এবং তার বিশ্বাসযোগ্য রূপ-দান ছিল ঔপন্যাসিকদের কাছে বড়ো। কোন মহাকাব্যের মতো পরিকল্পিত চরিত্র সৃষ্টি, বীরত্বগাথা বা মহাকাহিনী সৃষ্টি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে উপন্যাসে ধরা দিল সাধারণ অসহায় গরীব মানুষ, তাদের জীবনের কাহিনী—যারা সমাজের সাধারণ অবহেলিত শ্রেণী, সে সব হাভাতেদের হত্যার পদ্ধতি, প্রকৃতি এবং রূপায়ণ। এর সাথে কোন কোন উপন্যাসে এসেছে সে কলংকময় ঘটনা সংশ্লিষ্ট চরিত্র এবং ঘটনার নায়করা। অতএব শিল্পীদের অনুকরণে তৈরী করা হল এ গবেষণা পত্রের অধ্যায় এবং অনুসন্ধিৎসু বিষয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ জন কথা-শিল্পীর শতাধিক গল্প রয়েছে। পরিমাণের দিক থেকে রচিত কবিতা ও গল্পের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, প্রবন্ধ এবং চিত্রকর্মও এতো বেশী সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের জানা মতে, ইতিহাসের অন্য কোন বিষয় নিয়ে এত পরিমাণগত সৃষ্টি প্রাচুর্য নেই।

কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখি, সাহিত্যের অনেক শাখা প্রশাখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা হলেও সাহিত্যের গবেষণা শাখায় পঞ্চাশের মন্বন্তর গুরুত্ব পায়নি। ভয়াবহ এ মন্বন্তর নিয়ে রচিত শিল্প-ভান্ডার প্রাচুর্যে ভরপুর সত্ত্বেও আমরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প নামে মানস মজুমদারের একটি ছোট গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর তত্ত্বাবধানে বিনতা রায় চৌধুরীর এক মাত্র গবেষণা কর্ম পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য। সন্দেহ নেই বাংলা গবেষণা কর্মে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সাহিত্য নিয়ে এ আলোচনা 'প্রথম সৃষ্টি'। তবে এ বিষয়ের সমস্ত শিল্পকর্মকে তাঁর গবেষণার বিচরণভূমি করার কারণে হয়ত, আমরা তার আলোচনায় এক ধরণের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করি। আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে দুই বাংলার বারজন ঔপন্যাসিকের চৌদ্দটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হল। ড. বিনতা রায় চৌধুরীর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের উপন্যাস বিষয়ক অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের অনেকগুলি স্থান পায়নি বা নামমাত্র আলোচিত হয়েছে। বিশেষত পূর্ব-বাংলার উপন্যাস ছিল তাঁর কাজের বাইরে। ভুলবশত বাদ পড়েছে (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় বলেন) কমলকুমার মজুমদারের রচিত উপন্যাস 'খেলার প্রতিভা'। তবু প্রশংসা করতে হয়, তাঁর দুঃসাহসের। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত সমস্ত 'সাহিত্য কর্ম'কে গবেষণার বিষয় করার জন্য। এ ছাড়া আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর রচিত সাহিত্য নিয়ে পত্র পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ, গ্রন্থ সমালোচনা এবং রচনা সংকলনে সম্পাদকের বক্তব্য ইত্যাদি লাভ করি। পঞ্চাশের মন্বন্তর অর্ধশতাব্দীকাল আগে ঘটে গেলেও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত উপন্যাস বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে কোন প্রণালীবদ্ধ গবেষণা অদ্যাবধি হয় নি। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে গবেষণার বিষয় করেছি। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্বের ইতিহাস, এ মন্বন্তরের কারণ, পরিণাম এবং এ প্রসঙ্গে রচিত উপন্যাস। বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে শৃংখলাবদ্ধ ভাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আলোচনা করা হল। আমরা একটা আবিষ্কারে পৌছেছি। আবিষ্কারটি হচ্ছে, উপন্যাসগুলির নান্দনিক সাফল্য-ব্যর্থতা নয়, একটি বিশেষ কালের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে ঔপন্যাসিকেরা সমাজের বিবেক হিসাবে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর পাশাপাশি লাভ করেছি

ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে এ মন্বন্তরের যে কারণ সম-সাময়িককালের রচিত উপন্যাসে পাওয়া যায় - পরে অনুসন্ধানী গবেষকদের সাথে তার অদ্ভুত মিল। এই আবিষ্কার আমাদেরকে বিস্মিত করে।

এ গবেষণা পত্র বিন্যস্ত তিনটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্বের ইতিহাস। এ অধ্যায়টির প্রয়োজনীয়তা এ কারণে, এক দিনে হঠাৎ করে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর আসেনি। এর জন্য বিশাল একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, ঔপন্যাসিকরাও উপলব্ধি করেছেন এই বিষয়টা। ফলে মন্বন্তরের কাহিনী বর্ণনায় তাঁরা উপকরণ খুঁজেছেন বা ফ্লাশ ব্যাকে চলে গেছেন মন্বন্তরের আগের অর্থাৎ পূর্বের পরিস্থিতিতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণ, ফলাফল এবং এগুলির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। এ অধ্যায়টির প্রয়োজনীয়তা এখানে, উপন্যাসেও কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে এসেছে এগুলি, বাস্তবের সাথে উপন্যাসে রূপায়িত ঘটনার তুলনা করার জন্য এ অধ্যায়টি পড়া যেতে পারে। এখানে লক্ষণীয়, বিভিন্ন উপন্যাস বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে, তার কিছু কিছু মন্বন্তর চলাকালীন বা পরপরই রচিত হয়েছে যখন মন্বন্তরের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা অনুসন্ধান এবং ফলাফল প্রকাশ হয়নি। এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের অনুভূতি পরে বাস্তব দলিলের সাথে মিলে যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে এসেছে মন্বন্তরের উপন্যাস সমূহের নান্দনিক সার্থকতা বিচার। লেখকের উপলব্ধির বিশ্লেষণ, চরিত্রসৃষ্টির কৌশল এবং উপন্যাসের নির্বাচিত বিষয় বা কাঁচামাল, এবং প্লটের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। প্রসঙ্গে যোগ হয়েছে মন্বন্তরের উপন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য। এর সাথে একটি কথা বলা দরকার, মন্বন্তরের উপন্যাসগুলিতে মন্বন্তর নামক বিষয়টা প্রধান হলেও মন্বন্তরটা সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়ায়। ফলে ঔপন্যাসিকরা প্রায় উপন্যাসে ঘটনা এবং চরিত্র দুটোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচনার সময়ও আমরা লক্ষ রেখেছি এই দুই বিষয়ের প্রতি।

পরিশেষে উপসংহারে দেয়া হল উপন্যাস সমূহের মধ্য থেকে আহরিত লেখকদের দৃষ্টির সম্মিলিত রূপ, মন্বন্তর সম্পর্কে ধারণা। শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস

সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোড়িত 'মন্বন্তর' সংঘটিত হওয়ার মূল উৎস ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সমস্ত বিশ্লেষণের পর উপলব্ধিতে। মন্বন্তর এখনো পৃথিবীতে বিচরণ করছে। আমাদের দেশে এখন নিজেদের সরকার। কিন্তু এখনো সংকট সৃষ্টি করে মজুতদাররা, এখনও রয়ে গেছে দরিদ্র মানুষদের উপেক্ষা, অবহেলা করার নীতি, কিংবা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ অঞ্চলের প্রতি শোষণ নীতি। এখনো গণতান্ত্রিক দেশে শ্রমের মূল্য বৈষম্য মূলক। বেলাল চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয়, "সীমান্তের এপারে ওপারে দুই বাংলাতেই অসংখ্য মানুষ এখনও ক্ষুধা পীড়িত। অশিক্ষা, অপুষ্টি ক্ষুধা এবং আদিব্যাধি এখনও অগণিত মানুষের জীবনে ছায়ার মতো সঙ্গী। সুতরাং তেরোশ পঞ্চাশকে আমরা ভুলি কেমন করে"। (ভূমিকা, লঙ্গরখানা)। এ ছবি শুধু আমাদের ঘরে আমাদের সমাজে আমাদের দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও দেখি একই ছবি। আমাদের শ্রেণীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। তাই "ইথিওপিয়া, সুদান, সোমালিয়া - আফ্রিকার মানুষ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে মরেন, তখন আমরা তেরোশ পঞ্চাশের কথা স্মরণ না করে পারি না। কাগজে কাগজে কিংবা টেলিভিশনে ছবি যখন দেখি তখন শিউরে উঠে ভাবি এই সব কঙ্কাল কি আমাদের অনাত্মীয় ? তেরোশ পঞ্চাশে আমাদের অন্য প্রজন্মের মানুষ কি এভাবেই ক্ষুধার শিকার হন নি ?"(বেলাল চৌধুরী: তদেব)। আমরা অপেক্ষা করে আছি কখন সম্পদের, বিশেষ করে মৌলিক অধিকারের সুষম বন্টন ব্যবস্থা হবে ? কখন মানুষ বিশ্বের সমস্ত মানুষের ক্ষুধা, অপুষ্টির সংকটকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য তার মেধা, প্রযুক্তি, অর্থ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করবে। মার্কিন গবেষক পল-আর-গ্রীণো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মানব সভ্যতার যে রূপ দেখে ভারতকে 'অন্নদাতা কর্তৃক পোষ্যদের ত্যাগ' তত্ত্বে বন্দি করলেন কখন আমরা তার বিপরীত অবস্থা দেখব। আজকের যুগেও আমাদের দেখতে হচ্ছে, "উত্তর কোরিয়ার ক্ষুধার্ত মানুষ মানুষের গোশত খাচ্ছে"।(সূত্র-প্রবাহ, দৈনিক মুক্তকন্ঠ'র ম্যাগাজিন, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৮, ঢাকা)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এসেও দুর্ভিক্ষ ইচ্ছামত দাপট দেখিয়ে যায় ১৯৬০এ কঙ্গোতে, ১৯৬৮, ৭০ এবং ১৯৮৩ তে দা সাহেল এবং পূর্ব দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯৭২-৭৩এ ইথিওপিয়ায়, ১৯৭৪এ বাংলাদেশে, ১৯৭৫এ কাম্পুচিয়ায়। এ সব দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর পরিমাণও ভয়াবহ।

মন্বন্তর সমাজের স্পর্শকাতর বিষয়। যেখানে দুর্ঘটনায় সামান্য কিছু প্রাণ হত হলে আমরা ভাবি, দুঃখ প্রকাশ করি, সেখানে সামান্য কিছু মানুষের লোভে এখনো দুর্ভিক্ষ হয়। এখনো মানুষ অনাহারে মরে, আমরা সভ্য মানুষরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। এ গবেষণা পত্রে বিশ্লেষণের পরিশেষে দেখা গেছে, শিল্পীরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য মানুষকে চিহ্নিত করেছেন, আমরা জানলাম মানুষই মানুষের হত্যাকারী। শিল্পীরা শিল্পের মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন সে কলংকময় ঘটনা। জানিয়ে রেখেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য। হয়তো আগামী দিনে সতর্কতার জন্য। তাঁদের সহানুভূতিশীল হৃদয় প্রভাবিত করে আমাদেরও। এ গবেষণা পত্রের ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ এই 'মানুষ হত্যাকারী' থেকে আজকের এবং আগামী দিনের মানুষকে বাঁচানোর জন্য দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণে পূর্ব সতর্কতা কামনা করি।

শ্রদ্ধাসহ -

বিনীত

মো. শফিউল আলম